অধ্যায় ২ : শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য

বিন্যাসক্রম

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচিতি

২.৩ শ্রীকৃষ্ণবিজয় – মালাধর বসু

২.৩.১ কবি পরিচিতি

২.৩.২ নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু

২.৩.৩ কবি কৃতিত্ব

২.৩.৪ চরিত্র

২.৩.৫ সমাজ চিত্র

২.৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

২.৫ অতিরিক্ত পঠন

২.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

২.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনারা যে বিষয়ে অবগত হবেন—

- মালাধর বসু রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- আপনারা ভাগবতের অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর কবিত্বশক্তি অনুধাবন করতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বমুহূর্ত থেকে তাঁর বাল্যলীলা, বৃন্দাবন লীলা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের কাহিনি সূচির আলোচনাকে অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষপ্রান্তে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকবে এর উত্তর লিখতে পারবেন এবং কাব্যটির নির্বাচিত অংশের বিশ্লেষণও সঠিক ভাবে করতে পারবেন।

২.২ পরিচিতি

আদি মধ্যযুগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নাম আপনারা শুনেছেন। ঠিক তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগবত পুরাণের দু'টি অংশ নিয়ে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি লিখেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ভাগবত অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন বলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবির এক বিশেষ স্থান রয়েছে। কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন কবি ভক্তি সহকারে। পরবর্তীকালে চৈতন্য মহাপ্রভু এই কাব্যের পদ আস্বাদন করতেন বলে বৈষ্ণব ভক্ত সম্প্রদায়ের কাছে এই কাব্যটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃতে' শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যকে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' বলেও উল্লেখ করেছেন। আপনারা জেনে থাকবেন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল কংস বধ করবার জন্যে। বসুদেব ও দৈবকীর সন্তান হলেও শ্রীকৃষ্ণের শিশুকাল অতিবাহিত হয় নন্দ ঘোষ ও যশোদার ঘরে। সেখানেই কংস কৃষ্ণকে বধ করবার জন্যে বারবার বিভিন্ন অসুর পাঠিয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর রূপী কৃষ্ণ সকল অসুরকে বধ করে সব বাধা প্রতিহত করে বিজয়ী হন। রাধা কৃষ্ণের লীলা কাহিনি এমন কোনও লোক নেই যে জানে না, তাই আপনারা এই জানা বিষয়টিই আবার নতুন করে জানবেন। আপনারা রচয়িতা মালাধর বসুর সমকালের সমাজচিত্রের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবেন। এছাড়া অনেক পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ফলে আপনারা সঠিক উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারবেন।

২.৩ শ্রীকৃষ্ণবিজয় -মালাধর বসু

২.৩.১ কবি –পরিচিতি

মালাধর বসু পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে আত্মপরিচয় সূচক বিশেষ কোনো কিছু বলে যাননি। শুধুমাত্র কয়েকটি লাইন ইঙ্গিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস', 'বাপ ভগীরথ মোর মা ইন্দুমতী, 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান, 'সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন'। তাই মনে করা হয়, আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ভূদেব চৌধুরী মনে করেন, 'আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন সৎ কায়স্থ আনিয়েছিলেন, মালাধরের পূর্বপুরুষ দশরথ বসু তাঁদের অন্যতম। মালাধর বসু এই বংশোদ্ভূত ভগীরথ বসু ও ইন্দুমতীর সন্তান ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন সত্যরাজ খান এবং পৌত্র চৈতন্য পার্ষদ রামানন্দ বসু।

কবি মালাধর বসু পঞ্চদশ শতকের কোনও এক গৌড়ের সুলতানের দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছিলেন। সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা অনুমান করেন তাঁর রচিত কাব্যটি সমাপ্ত হবার আগেই সেই সময়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। চৈতন্য আবির্ভাবের প্রায় তেরো বছর আগে ভাগবত অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন কবি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে মালাধর বসুর 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই লাইনটি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এছাড়া মালাধর বসু কুলীন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে শ্রীচৈতন্য এই গ্রামের সকলকেই সবসময় সম্মান জানাতেন । চৈতন্যদেবের এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'-

'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর।।'

কবির প্রতি চৈতন্যদেবের এই অগাধ শ্রদ্ধাবোধ মালাধর বসুর কৃষ্ণভক্তির কারণেই হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২.৩.২ নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু

আলোচ্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুসরণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি আরও অন্যান্য কাহিনি থেকে বিষয় সংগ্রহ করেছেন। আমরা জানি যে, যুগের প্রয়োজনে নারায়ণের কৃষ্ণ অবতারের আবির্ভাব হয়েছিল। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা বা বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা এবং দ্বারকা লীলা। শ্রীকৃষ্ণের গোটা জীবনকেই এঁকেছেন কবি। তবে আপনারা শুধুমাত্র প্রথম অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই পাঠ হিসাবে পাবেন।

মালাধর বসু দেবদেবীর বন্দনা দিয়ে কাব্যটি শুরু করেছেন। এরপর বিষয় নির্দেশ করে নারায়ণের দ্বাবিংশতি অর্থাৎ বিষ্ণুর বাইশজন অবতারের লীলা কীর্তন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য কবি 'পৃথিবী রোদন' অংশে দেখিয়েছেন, অসুরদের অত্যাচারে ভারাক্রান্তা পৃথিবীর অভিযোগে, ব্রহ্মা নারায়ণের কাছে এর প্রতিবেদনের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং নারায়ণ তাঁকে অভয় প্রদান করেছিলেন। রাজা কংস তার বোন দৈবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব ধুমধাম করে। কিন্তু নারদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের দ্বারা তাঁর মৃত্যু ঘটবে। ফলে কংস দৈবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, সদ্যোজাত শিশু কৃষ্ণকে রক্ষা করতে বসুদেব গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়িতে শিশু কৃষ্ণকে রেখে আসেন এবং পরিবর্তে যশোদার গর্ভে জাত মহামায়াকে নিয়ে আসেন। কংস যোগমায়াকে মারতে উদ্যত হলে

যোগমায়ার কাছ থেকে কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত শুনে তিনি ভীষণ আতঙ্কিত হন। কংস চানূর, মুষ্টিক, কেশী ,বকাসুর অরিষ্ট,পূতনা প্রভৃতি অসুরদের সঙ্গে কৃষ্ণ হত্যার ষড়যন্ত্র করেন।

শিশুদের হত্যা করতে পারদর্শিনী পূতনা গোকুলে এসে কৃষ্ণকে বিষস্তন পান করিয়ে হত্যার উদ্যোগ করলে কৃষ্ণের দ্বারা পূতনা রাক্ষসীর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের সময় কংসের প্রেরিত শকটের (গাড়ি বা যান) দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় কিন্তু কৃষ্ণের পদাঘাতে শকটটি ভেঙে যায়।এরপর তৃণাবর্ত অসুর বাঘের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে হত্যা করতে চাইলে কৃষ্ণ শূন্যলোক থেকে মাটিতে ফেলে তাকে বধ করেন।

কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ করেন নন্দ ঘোষের কুলপুরোহিত গর্গমুনি। তিনি রোহিণীর পুত্র বলে বলরামের নাম দেন রৌহিনেয় ও সঙ্কর্ষণ। ছোট্ট কৃষ্ণ খেলতে খেলতে মাটি খেয়ে ফেললে যশোদা অস্থির হয়ে পড়েন এবং শিশু কৃষ্ণের মুখ থেকে মাটি বের করতে গিয়ে মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পান। যশোদা অনেকসময় কৃষ্ণের অতিরিক্ত মাখন, দুধ, দই খাওয়া নিবারণ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বৃথা বেঁধে রাখার চেষ্টা করেন । নারদের অভিশাপে ইন্দ্রের দুই ছেলে নল ও কুবের বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল কৃষ্ণের দ্বারা তাদের শাপমোচন হয়। আবার কৃষ্ণ কোনো এক ফল বিক্রয়কারিণী থেকে ফল নিয়ে ধান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রতিটি ধান রত্নে পরিণত হয়েছিল।

গোকুলে অসুরদের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নন্দ বৃন্দাবনে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানেও গোচারণে ব্যস্ত কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্যে কংস আরও অসুরদের পাঠিয়েছিলেন, যেমন বৎসাসুর, বকরূপী বকাসুর, অজগররূপী অঘাসুর, ধেনুকাসুর। তাদের সকলকে কৃষ্ণ বধ করেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাছুরগুলিকে ব্রহ্মা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার কিন্তু কৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাবলে সেইসব বাছুরদের আবার সৃষ্টি করলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কালীদহের বিষাক্ত জল খেয়ে কৃষ্ণের সহচরদের মৃত্যু হলে কালীয় নাগকে শিক্ষা দেবার জন্যে কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপ ধারণ করে কালীয় নাগের প্রাণনাশ করেন। পরে অবশ্য তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে তাকে রমনক পর্বতে পাঠিয়ে দেন। গ্রীষ্মের দাবদাহে বনে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হলে দাবানল পান করে গোকুলবাসীদের কৃষ্ণ রক্ষা করেন। যমুনার তীরে ভাণ্ডীর বনে খেলায় মত্ত কৃষ্ণ ও বলরামকে রাক্ষস প্রলম্বাসুর বধ করতে এলে বলরাম সেই অসুরকে মাটিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। এই বনেই অন্যান্য গোপ-বালকরা হঠাৎ দাবানলে পতিত হলে কৃষ্ণ সেই দাবানল নিভিয়ে দেন।

মালাধর বসু বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা করে শরৎকালে ব্রজের গোপীদের চণ্ডীব্রতের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। এই ব্রত উদযাপনের জন্যে বস্ত্র ছেড়ে যমুনায় যখন গোপীরা স্নান করতে নামে, কৃষ্ণ তাদের বস্ত্র লুকিয়ে রাখেন পরে তাদের কাতর মিনতিতে বস্ত্র ফিরিয়ে দেন । বৃন্দাবনের

শারদ পূর্ণিমায় প্রাকৃতিক মাধুর্য দেখে কৃষ্ণ রাসলীলা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে সকল গোপীদের আহ্বান করেন। গোপীরা গৃহস্থালির সকল কাজে ভুল করে বসে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলায় এসে যোগদান করে।

বৃন্দাবনে অনাবৃষ্টিতে গৃহপালিত পশুদের খাদ্যসুরক্ষায় নন্দ ও গোপদের ইন্দ্রপুজো করার সিদ্ধান্তে কৃষ্ণ রাজি হননি। তিনি ইন্দ্রের পরিবর্তে গোবর্ধন পর্বত পুজোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে ইন্দ্রের প্রচণ্ড রাগে ঝড়-বৃষ্টিপাত সংঘটিত হলে গোবর্ধন পর্বত আঙ্গুলে উত্থিত করে সকলের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। কয়েকদিন পর বরুণের দূত নন্দকে হরণ করে পাতালে লুকিয়ে রাখলে কৃষ্ণ বরুণালয়ে গিয়ে পিতাকে উদ্ধার করেন এবং বরুণদেবতা কৃষ্ণদর্শনে আনন্দিত হন।

২.৩.৩ কবি কৃতিত্ব

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথাকে নিয়ে প্রধানত কাব্য রচনা করেছিলেন। মালাধর বসু কবি হলেও তিনি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কথা লিখেছেন ভক্তের দৃষ্টিতে। ভাগবতের কাহিনিকে পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে বেঁধে তিনি কাব্যটি লিখেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় লেখা, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি বাংলা ভাষায় কাব্যটি লিখেছিলেন। সে সময়ের দুর্বল বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁর শিল্পীসত্তা দিয়ে চেষ্টা করেছেন কাব্যটিকে কিভাবে মনোগ্রাহী করে তোলা যায়।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তিনি ভাগবতের মূল ভাবনা নিয়ে শুধুমাত্র দশম ও একাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণের জীবনের কথাই মূলত বলতে চেয়েছেন। আসলে যুগের তাগিদে কৃষ্ণের পরাক্রমশালী চরিত্রের বর্ণনা দরকার ছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙালি জাতির বিষাদগ্রস্ততা সেইসময়ের কবিদের নিশ্চিতভাবেই উদগ্রীব করেছিল, তাই হতোদ্যম বাঙালির জাতীয় জীবনে এধরনের একজন আদর্শ বীর চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই দেখা যায় সমগ্র কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে-

"আকাশের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।।
পৃথুবির রেনু জদি করিএ গমন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন।।"

শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি কাহিনি লিপিবদ্ধ করা এবং ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুরূহ ভাগবত তত্ত্বকথা আত্মীকরণ করে কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন মালাধর বসু। কাব্যে বীর রস ও অদ্ভুত রসের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো। কৃষ্ণের ভয়ানক অসুরদের একে একে বধ করা একই সঙ্গে

পাঠকের মনে এই দুটি রসেরই উদ্ভব ঘটায়। কবি কাব্যটিতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকারের প্রয়োগ করেছেন নিপুণভাবে। পূতনার শবদেহের বর্ণনায় কবি লিখেছেন,

"লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি
উদর গোটা দেখি জেন যুখান পোখরি।"

কৃষ্ণের হাতে পূতনা রাক্ষুসীর মৃত্যু হলে তার বিকট কুৎসিত দেহ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে ঈশ্বরের স্পর্শে পূতনার স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় এই সুগন্ধির কথা কবি যুক্ত করেছেন। এইভাবে অলংকার এবং রসের প্রয়োগে কাব্যটির সৌন্দর্য বেড়ে গেছে একথা বলা যেতে পারে।

মালাধর বসুর স্বকীয়তা ধরা পড়ে বৃন্দাবনের শারদ প্রকৃতির বর্ণনায়। গতানুগতিক ধারা অবলম্বন করলেও দেশজ অনেক বৃক্ষের নাম এখানে উল্লেখ করেছেন কবি। বিশেষ করে তিনি শারদ পূর্ণিমা রাত্রির বর্ণনা সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

"সরত পূর্ণিমা সসি কইল উদয়।
সুগন্ধ সিতল বা মনোহর বয়।।
নব কিসলয় জত সব বৃন্দাবনে।
অধিক দ্বিপতি হৈল চন্দ্রের কিরনে।।"

শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় শৃঙ্গার রসের বর্ণনাও পরিশীলিত এবং পরিমিত। কারণ ভাগবতের যথাযথ বিষয় বর্ণনা, দার্শনিক তত্ত্ব ও বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণের মধুরলীলার রূপ বিশ্লেষণ কবির অভিপ্রেত ছিল না। অনেক সমালোচক মনে করেন, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালি'তে যেমনভাবে বঙ্গজ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তেমনি কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেও বাঙালি চরিত্রের রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের মত জনপ্রিয়তা না পেলেও কবির সমকালের সাহিত্য ধারায় তিনি অম্লান। লক্ষনীয়, বাংলা ভাষায় ভাগবত রচনায় তিনিই পথিকৃৎ, এর পরবর্তীকালে আরও ভাগবতের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থে মালাধর বসুর প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় তখনই শ্রীচৈতন্য যেসব কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থ থেকে ভক্তি রস আস্বাদন করতেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি এর মধ্যে একটি। তাই সামগ্রিক ভাবে বলা যায় মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনায় তাঁর ভক্তিরস নিংড়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়েছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে বা পরবর্তীকালে অনেক কবিদের রচনায় শিল্প সৌকর্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে যেখানে পূর্বসূরিদের দর্শানো পথ নেই

বললেই চলে সেখান থেকে কাব্যটির মধ্যে যতটুকু শিল্পত্ব দরকার কবি সেটুকু অতি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

২.৩.৪ চরিত্র আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের অলৌকিক বীরত্বগাথা কাব্যটির মূল সুরকে চালিত করেছে এবং কৃষ্ণ চরিত্রের বর্ণনায় কাব্যটি চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। ওর বসুদেব ও দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের জন্মের কারণও খুব স্পষ্ট। কংসের অত্যাচারে অতিষ্ট মথুরাবাসীর জীবনকে রক্ষা করতে এবং কংসকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব। দৈবকীর অষ্টম সন্তান হিসেবে ঈশ্বরের অবতার জন্ম নেবে শুনে কংস তার প্রধান অনুচর সেনাপতি চাণুর ও মুষ্টিকের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন তাঁকে কীভাবে হত্যা করা যায়। আতঙ্কিত দৈবকীর অশুভ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর তার পাশে শায়িত কৃষ্ণকে দেখে যেমন স্বস্তি পান তেমনি যশোদাও ঘুম ভেঙে দেখতে পান পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল এক শিশু তার পাশে শুয়ে আছে।

"নিন্দে হইতে উঠি জসোদা পুত্র দেখে পাশে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র যেন উগিল আকাসে।।"

শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর থেকেই নিজের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা নিজেই করেছেন। মহামায়ার ভবিষ্যদ্বাণী অগ্রাহ্য করতে পারেনি কংস, তাই গোকুলে বারবার তার অনুচরদের পাঠিয়েছিল কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্যে। শিশুকালে কৃষ্ণকে মারতে না পারলে বড় হয়ে এই শিশুই একদিন কংসের কাল হয়ে দাঁড়াবে; তাই সকল অসুরদের সঙ্গে কংস শলাপরামর্শ করতে লাগলেন কীভাবে কৃষ্ণকে হত্যা করা যায় –

"সিষুকালে না মাইলে হব বড় কাল।
প্রবিন হইলে হইব মারিতে জঞ্জাল।।"

প্রথমেই কংস পূতনাকে পাঠিয়েছিলেন বিষস্তন পান করিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্যে। তারপর তৃণাবর্ত, অঘাসুর ইত্যাদি আরও অন্যান্য অসুর বধ করে কৃষ্ণ কংসকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন।এর মাধ্যমে কৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্রের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ কেবল অসুরদের দমন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকেও উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। গোকুলের অধিবাসীরা বৃষ্টিপাতের জন্যে ইন্দ্রের পুজোর আয়োজন করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত পুজো করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু করেছিলেন। সাত বছরের কৃষ্ণ তখন গোবর্ধন পর্বত উৎপাটিত করে গোকুল বাসীদের রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্র পরাস্ত হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন । এছাড়া

নন্দ ঘোষ স্নান করার উদ্দেশ্যে যমুনা নদীতে নামলে বরুণ দেবতার অনুচর নন্দকে পাতালে বরুণের পুরিতে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে কৃষ্ণ বরুণের পুরিতে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসামান্য ক্ষমতার বলে ত্রিলোক বিজয় করেছিলেন।

কৃষ্ণের প্রেমিক সত্তার প্রকাশ দেখা যায় রাসলীলা অংশে। তাঁর বয়স তখন মাত্র বার বছর, তাঁর রূপ দর্শন করে গোপীরা কামবাণে মূর্ছিতা হয়েছিলেন। কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনে গোপীরা গৃহস্থালির সকল কাজ ভুলে রাসলীলা মণ্ডপে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলায় যোগদান করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বীর রসের কাব্য। কাব্যের প্রধান চরিত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অলৌকিকতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও কবি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন। সমালোচকের ভাষায়- 'কৃষ্ণচরিত্রে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত প্রভৃতি মহাকাব্যের নায়কোচিত গুনাবলী বর্তমান।'

২.৩.৫ সমাজ চিত্র

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটিতে মালাধর বসু ভাগবতের যথাযথ বর্ণনা করেননি। ঐশী শক্তির অধিকারী কৃষ্ণের জীবনচিত্র আকঁতে গিয়ে ভাগবত ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থ ও লোককথাকে চয়ন করেছেন।

মালাধর বসুও সমাজসচেতন কবি ছিলেন। কৃষ্ণের জীবনকথাতে অবলীলায় সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার ছবি ফুটে ওঠে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে যেভাবে সমাজ বাস্তবতার চিত্র পরিস্ফুট ততটা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে চিত্রিত না হলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই কাব্যে সমাজজীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

নন্দ ঘোষ পুত্র সন্তান জন্ম নেবার পর কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন গোকুলের ব্রাহ্মণদের কুড়ি হাজার গরু দান করে –

"পুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হঞা।
কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মন আনিয়া।।"

পুত্রসন্তান জন্ম হলে দেশের রাজাকেও উপঢৌকন দেবার রীতি ছিল। নন্দের আদেশে সকল গোয়ালারা দই, দুধ, ঘি, ঘোল ইত্যাদিতে শকট পরিপূর্ণ করে কংসের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিল।

সেই সময়ের সমাজে নামকরণ অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। কাব্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ অনুষ্ঠানে কুল পুরোহিত গর্গমুনি এসে নবজাতকের নামকরণ করেন। মুনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, এই দুই শিশু গোকুল বাসীদের সবসময় রক্ষা করবে কিন্তু তাদেরকেও সাবধানে রাখতে হবে। পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর ইত্যাদি অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশু কৃষ্ণকে ও বলরামকে স্বর্গের গঙ্গাজল দিয়ে রক্ষামন্ত্র বেঁধে দেওয়া হয় যাতে কোনো দুষ্টশক্তি তাঁদের ক্ষতি না করতে পারে।

মধ্যযুগের অভিজাত বাঙালি সমাজের শিশুরা যেভাবে গায়ে তেল-হলুদ দিয়ে স্নান করে নদীতে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে অর্ঘ্য দিত, কৃষ্ণকেও সেরকম নদীতে তর্পণ করতে দেখা যায়-

"দন্ত ধাবন কৈল জল সন্নিধানে।
শ্রান তর্পণ কৈল দেবের বিধানে।।"

শিশু কৃষ্ণ এবং অন্যান্য গোপ বালকদের মধ্যে ভেতো বাঙালির চরিত্রই যেন ফুটে ওঠে। যেমন শিশু বালকদের খেলা থামিয়ে ভাত খাওয়ার জন্যে মা বাবারা অনুরোধ করেন- 'ভাত খাঞা পুনরপি খেলাহ আসিঞা।' আবার আরেক জায়গায় দেখা যায় 'বাছুর রাখি ভাত খাব জমুনার কুলে।' ইত্যাদিতে বাঙালি সমাজের শিশুদের ভাত খাওয়ার অভ্যাস চিত্রিত হয়েছে।

গোকুলের গোয়ালা জাতির প্রধান জীবিকা ছিল গো-পালন। অতিথি আপ্যায়ন বা প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে গোপ মহিলারা গরুর দুধ থেকে উৎপাদিত দই, ঘি, ঘোল এছাড়া ছানা দিয়ে তৈরি নানা রকমের মিষ্টি ইত্যাদি তৈরি করে পরিবেশন করত। কোনো সময় তারা এইসব কাজ করতে করতে গদাধর অর্থাৎ কৃষ্ণের লীলা কীর্তন করত। যেমন কাব্যে উল্লেখ রয়েছে দধি মন্থন করার সময় তারা সকলে মিলে গান করছে।

"আপনে মথয়ে দধি করে ছর ছর।
গীত বন্ধে গাএ জত কৈল গদাধর।।"

অনাবৃষ্টিতে গৃহপালিত পশুদের খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের দেবতা ইন্দ্রকে পুজো করার রীতি প্রচলিত ছিল বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ ইন্দ্রের বদলে গিরি গোবর্ধনকে পুজো করার কথা বলেছিলেন। এছাড়া কাব্যটির মধ্যে মালাকার, মৎসজীবি, ব্যাধ, রজক ইত্যাদি জাতির উল্লেখ রয়েছে। কৃষিকাজও অনেক মানুষের জীবিকা ছিল, কারণ পূতনার বিরাট শবদেহের বর্ণনায় লাঙ্গল, হাল ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ রয়েছে কাব্যটির মধ্যে।

সে যুগের সমাজে দেখা যায়, গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করতে হত। লক্ষণীয়, কাব্যটিতে কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির আশ্রমে থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। গুরুর প্রতিদিনের ঘরের কাজে তাঁদেরকে সহায়তা করতে হত। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর গুরুদক্ষিণা দেওয়ার রীতি ছিল। গুরুদক্ষিণা হিসেবে গুরুমা'র কথায় কৃষ্ণ তাদের মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এইভাবে কৃষ্ণের বাল্যলীলায় গোকুলের এবং বৃন্দাবনের সমাজ জীবনের যে পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন এর মধ্য দিয়ে আমাদের পরিচিত বঙ্গ দেশের সমাজজীবনই যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মালাধর বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।

২। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের প্রধান চরিত্র কোনটি ? চরিত্রটি আলোচনা করুন।

২.৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- যে কাব্যটি পড়া হল তা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত হয়েছে। কাব্যটির সময়কাল পঞ্চদশ শতক।
- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।
- যুগের প্রয়োজনে কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন। অসুরদের অত্যাচারে ভারাক্রান্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্যে এবং দুষ্টদের দমন করবার জন্যেই মূলত তাঁর আবির্ভাব। অন্যায়, অধর্মের প্রতিবিধান করে কৃষ্ণ ধর্মের জয় ঘোষণা করেছিলেন।
- কাব্যটি অনুবাদমূলক রচনা হলেও কবির মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে।
- মালাধর বসুর এই কাব্যে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা, সমাজজীবন এবং প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

২.৫ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

২.৬ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১। নং প্রশ্নের উত্তর: মালাধর বসু পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।..... তাঁর পুত্র ছিলেন সত্যরাজ খান এবং পৌত্র চৈতন্য পার্ষদ রামানন্দ বসু। ..... কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে মালাধর বসুর 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই লাইনটি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর: শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। তাঁর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল কংস ও আরও অসুরদের বধ করে পৃথিবীবাসীর শান্তি আনয়ন করা ..... তিনি কীভাবে সকলের সমস্যা দূরিভূত করেন.....তাঁর অলৌকিক লীলাকাহিনির বর্ণনা করবেন।..... কৃষ্ণের নায়কোচিত গুনাবলী উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ২.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন নং ১। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের বৃন্দাবন লীলা অংশের বর্ণনা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

প্রশ্ন নং ২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

প্রশ্ন নং ৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের বৃন্দাবন লীলা অংশের সমাজচিত্রের পরিচয় দিন।

প্রশ্ন নং ৪। মালাধর বসুর কবি কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

*** *** ***